গাজওয়াতুল হিন্দ

এর সংক্ষিপ্ত আলোচনা

بسم الله الرحمن الرحيم
(বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম)

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ তা'আলার জন্য। দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক শেষ নাবী ও রসূল মুহাম্মাদ (ছল্লালহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর উপর।

যখন এই পৃথিবীর অস্তিত্ব বলতে কিছুই ছিল না। ঠিক তখনই সেই মূহুর্তে মহা মহিমাময় পরাক্রমশালী আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছে করলেন, এতো সুন্দর পৃথিবীর সৃষ্টির যেখানে মহান আল্লাহ তা'আলার দাসগণ নিরাপদে বসাবস করবে এবং শুধু মাত্র এক আল্লাহ তা'আলারই দাসত্ব করবে, আর এই সকল দাস-দাসীদের প্রয়োজনার্থে এই আসমান-যমিনকে সুসজ্জিত সাজিয়ে দিলেন সকল প্রকার সুন্দর ও সুশোভিত সরঞ্জাম দ্বারা। যেন মহান আল্লাহ তা'আলার দাস-দাসীগণের পৃথিবীতে বসবাসে কোন সমস্যায় কঠিন বাধাগ্রস্থ না হতে হয়, আর সেই সাথে তাদের জন্য দিয়ে দিলেন অফুরন্ত জীবিকা। যেন তারা কোন কিছুতেই অভাব অনুভব না করে। এভাবেই পৃথিবীর সৌন্দর্য দ্বারা পূর্ণতা লাভ করে পৃথিবী। এভাবেই ক্রমান্বয়ে পৃথিবীতে জন্ম লাভের মাধ্যমে বৃদ্ধি হতে থাকে মানুষ। আসতে থাকে অসংখ্য নাবী ও রসূল, সে সাথে আসমানী কিতাব। ধীরে ধীরে অধিকাংশ মানুষই ভুলতে থাকে তাদের সৃষ্টির ইতিহাসের কথা। ভুলে যায়, এক সময় তাদের অস্তিত্বই ছিল না। অস্তিত্ব ছিল না এ মায়াময় পৃথিবীর, ভুলতে থাকে তারা এ কথা। এই অস্তিত্ব দান করেছেন সর্ব বিষয়ে সর্ব শক্তিমান আল্লাহ তা'য়ালাই আর নির্দিষ্ট কোন একদিন এর ধ্বংসও সুনিশ্চিত। কেননা, একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই চিরঞ্জীব, যার ধ্বংস নেই। আর এ কথাই মানব জাতিকে বারবার স্মরণ করে দিয়েছে আল্লাহর প্রেরিত নাবী-রসূলগণ। আর ভবিষ্যদ্বাণী দিয়ে গেছেন শেষ জামানার আগমনকারী আখেরী নাবী মুহাম্মাদ (ছল্লালহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর। তবুও কি এসকল অজ্ঞ ও ত্বরাপ্রবণ মানবজাতি পয়গম্বরদের কথা বিশ্বাস করতে চায়? যতক্ষণ না পয়গম্বরদের ভবিষ্যদ্বাণী স্বচক্ষে ফলে যেতে দেখবে, ততক্ষণ তারা তা মানতে নারাজ আর এজন্য নাবী-রসূলদেরকে মিথ্যাবাদী অপবাদও দিয়েছে অনেক দাম্ভিক, অহংকারী সম্প্রদায়। ফলে তাদের অধিকাংশকেই ধ্বংস করেও দিয়েছেন আল্লাহ তা'আলা। অবশ্য তা দেখে শিক্ষাও গ্রহণ করেছে অনেকেই। কালের পরিবর্তনে যখন ক্রমান্বয়ে চলে আসলো শেষ জামানা, মানব যখন সুশৃঙ্খল জাতি থেকে বিশৃঙ্খল জাতিতে পরিণত হল, যখন বৃদ্ধি পেল অসভ্য ও বর্বরতা, মানুষ যখন অন্ধারে পথহারা-দিশেহারা দৌড়ে পৌছে গিয়েছিল অগ্নির দারপ্রান্তে, ঠিক সেই সময়ে এই সকল মানবদের

সঠিক পথের দিশা দিয়ে অসভ্য, বর্বরতা দূর করে তাদের মাঝে হেদায়েতের আলো জ্বালিয়ে দিলেন শেষ যামানার আগমন কারী আখিরী নাবী মুহাম্মাদ (ﷺ)। মাত্র ২৩টি বছরের ব্যবধানে অর্ধ জাহানে মানবদের মাঝে ইসলামের আলো ছড়িয়ে দিয়ে বিশ্ববাসীকে উপহার দিলেন একটি সময়। যার নাম 'খাইরাল কুরুন' তথা পৃথিবীর সর্বোত্তম যুগ। এ কথা সুস্পষ্ট যে, মুহাম্মাদ (ﷺ)-ই আখেরী তথা শেষ নবী, আর কোন নবী-রসূল আসবে না। আসার সম্ভবনাও নেই। আর তার প্রয়োজনও নেই। কেননা, একমাত্র মুহাম্মাদ (ﷺ)-ই হলো শেষ যামানার শেষ নবী। এরপর আর নাবী আগমনের কোন যামানাও নেই, নাবী-রসূল আগমনের প্রয়োজনও নেই। এখন পৃথিবীর শেষ গন্তব্য 'কিয়ামত'। মুহাম্মাদ (ﷺ) এরশাদ করেন, আমি আর কিয়ামতের মাঝে এরূপ ব্যবধান একথা বলে তিনি তার তর্জনী ও মধ্যমা আঙ্গুল একত্র করে দেখান। তিনি আরো বলেন, হযরত ইরবাজ সারিয়া (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল (ﷺ) কে বলতে শুনেছি, নিঃসন্দেহে আমি আল্লাহ তা'আলার বান্দা এবং শেষ নবী। (মুসতাদরাকে হাকেম)

হযরত আবু হুরাইরা (রা.) বলেন, রসূল (ﷺ) বলেছেন, আমার এবং আমার পূর্ববর্তী নাবীগণের দৃষ্টান্ত এমন যেমন এক ব্যক্তি ঘর বানিয়েছে এবং তার মধ্যে সকল প্রকার কারুকার্য ও সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছে। কিন্তু ঘরে কোন এক কোণে একটি ইটের জায়গা খালি রেখে দিয়েছে। এখন লোকেরা চারদিকে ঘুরে দেখে ঘরের সৌন্দর্য প্রশংসা করে কিন্তু এই কথা বলে যে, এই জায়গায় একটি ইট কেন রাখা হল না? সুতরাং, আমিই সেই ইট এবং আমিই শেষ নাবী। (বুখারী, অধ্যায়ঃ খতামান্নাবীই)

অন্যান্য নবী রসূলগণ যেমন আহমাদ নামে আখেরী নাবী আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী দিয়ে গিয়েছিলেন, তদরূপ আমাদের নেতা আল্লাহর নাবী মুহাম্মাদ (ﷺ) ও শেষ যামানার শেষ সময়ে কিয়ামাত ভবিষ্যদ্বাণী দিয়ে গেছেন। যার মধ্যে গাজওয়াতুল হিন্দ তথা হিন্দুস্থানের যুদ্ধও একটি। সে সম্পর্কে রসূল (ﷺ) এর হাদিস বর্ণিত হয়েছে। তা হলো, আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ) আমাদের থেকে হিন্দুস্থানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার প্রতিশ্রুতি নিয়েছেন। কাজেই আমি যদি সেই যুদ্ধের নাগাল পেয়ে যাই, তাহলে আমি তাতে আমার জীবন ও সম্পদ ব্যয় করে ফেলবো। যদি নিহত হই তাহলে আমি শ্রেষ্ঠতর শহীদের অন্তর্ভুক্ত হব। আর যদি আমি ফিরে আসি, তাহলে আমি জাহান্নাম থেকে মুক্তি প্রাপ্ত আবু হুরাইরা হয়ে যাব। (সুনানে নাসায়ী, খন্ড-৬, পৃঃ ৪২; কিতাবুল ফিরদাউস, ৮৭৪)

কখন হবে গাজওয়াতুল হিন্দ

গাজওয়াতুল হিন্দ অর্থ হিন্দুস্থানের যুদ্ধ। যার পারিভাষিক অর্থ হিন্দুস্থানের তথা ভারতের মুশরিকদের সঙ্গে ঈমানদার মুসলমানদের যুদ্ধ। আবার অনেকেই ভাবেন মুহাম্মাদ বিন কাশিমের সময় এই যুদ্ধটি হয়ে গেছে। তাদের এই ধারণাটা ভুল। কেননা, যদি সেই যুদ্ধটা হয়েই যেত তাহলে এতো দিনে খলিফা মাহদী সহ মরিয়াম তনয় ইসা (আ.) এ আত্বপ্রকাশ হয়ে যেত। আর এই যুদ্ধটা যেহেতু হিন্দুস্থান থেকে মুশরিকদের চিরতরে উৎখাতের যুদ্ধ। উদাহরণ স্বরূপ যেমনটি মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে আরব থেকে মুশরিকদের চিরতরে উৎখাত করা হয়েছে। আর সেজন্যই এই্ যুদ্ধটাকে গাজওয়া বলা হয়। আর 'গাজওয়া' সেই যুদ্ধকে বলা হয় যে যুদ্ধে আল্লাহর রসূল (ﷺ) স্বশরীরে উপস্থিত থেকেছেন। আর বাকী যুদ্ধগুলোকে 'সারিয়া' বলা হয়। আর এ যুদ্ধে আল্লাহর রসূল (ﷺ) স্বশরীরে উপস্থিত থাকছেন না। কিন্তু মক্কা বিজয়ের কিছু সাদৃশ্য এ যুদ্ধে রয়েছে। এ যুদ্ধ ব্যতিত তথা গাজওয়াতুল হিন্দ ব্যতিত আল্লাহর রসূল (ﷺ) এর মৃত্যুর পরে আর কোন যুদ্ধকে গাজওয়া বলা হয় নাই। তবে হিন্দুস্থানের মুশরিকদের সঙ্গে মুসলমানদের সকল ধর্মীয় যুদ্ধগলোই গাজওয়াতুল হিন্দের অন্তর্ভুক্ত। আর গাজওয়াতুল হিন্দ শুরু হয়েছে ২৩ হিজরীতে খলিফা আমিরুল মুমিনীন হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.) এর শাসন আমল থেকে। আর এই গাজওয়াতুল হিন্দের চূড়ান্ত পর্যায়ে মুসলমানগণ পূর্ণাঙ্গ হিন্দুস্থান বিজয় করবে। যার ফলে হিন্দুস্থান থেকে মুশরিকরা চিরতরে উৎখাত হবে। আর সম্মানিত প্রতিশ্রুতি চূড়ান্ত যুদ্ধের সময় সম্পর্কে আল্লাহর রসূল (ﷺ) ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন আজ থেকে ১৪০০ বছর পূর্বে।

হাদিস

১। হযরত হুযায়ফা (রা.) বলেছেন, আমি আল্লাহর কসম খেয়ে বলছি, আল্লাহর রসূল (ﷺ) এমন একটা ফিতনাও বর্ণনা করতে বাদ রাখেননি যেগুলো পৃথিবী ধ্বংস হওয়া পর্যন্ত সময়ে সংঘটিত হবে এবং তার নেতৃত্বদানকারী সংখ্যা তিনশো বা তারও বেশি হবে। নবীজি (ﷺ) প্রতিটি ফেতনার আলোচনা কালে তার নেতার নাম, নেতার পিতার নাম, গোত্রের নাম উল্লেখ করেছেন। (সুনানে আবু দাউদ; মাহদী ও দাজ্জাল-আসেম ওমর, পৃঃ ৩৯৬)

২। হযরত হুযাইফা (রা.) বলেন, আমি আল্লাহর কসম খেয়ে বলছি আমি জানিনা, আমার এই বন্ধুরা ভুলে গেছে নাকি স্মরণ থাকা সত্ত্বেও ভুলে যাওয়ার ভান ধরে আছে। আল্লাহর কসম!

আল্লাহর রসূল (ﷺ) কেয়ামত পর্যন্ত জন্ম লাভ করবে এমন একজনও নৈরাজ সৃষ্টিকারীর নাম উল্লেখ করতে বাদ রাখেননি। তিনি একজন নৈরাজ সৃষ্টিকারীর কথা উল্লে করার সময় আমাদেরকে তার নিজের, তার পিতার, তার গোত্রের নাম বলে দিয়েছেন। (সুনানে আবু দাউদঃ কিতাবুল ফিতান)

৩। হযরত আবু হুরাইরা (রা.) বলেন, রসূল (ﷺ) বলেছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না পাঁচ নেতার আত্মপ্রকাশ ঘটবে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল (ﷺ), তাদের চেনার উপায় কী? তিনি বললেন, তাদের একজন তোমাদের এ ভূমিতে জন্ম নিবে। যার নাম আমার নামের অনুরূপ। সে ক্ষমতায় থেকে ইসলামকে গলা চেপে হত্যা করবে। তথা ইসলাম ধ্বংসের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র করবে। আর একজন অভিশপ্ত জাতির সন্তান। সে বিশ্ব শাসন করবে। আর তিনজন হবে হিন্দুস্থানের নেতা। যাদের একজন ক্ষমতায় থেকে ইসলাম ধ্বংসের সূচনা করবে। আর একজন ইসলাম ধ্বংসের প্রতিশ্রুতি দিয়েই ক্ষমতায় আসবে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল (ﷺ) তারা তিনজন কী মুশরিক হবে? তিনি (ﷺ) বললেন, বরং তাদের একজন হবে নামে মুসলিম নারী শাসক। সে ক্ষমতায় এসে তার পূর্ব পুরুষের মূর্তি পূজা বৃদ্ধি করবে। অবশ্যই সেখানকার দূর্গম নামক অঞ্চল থেকে একজন দূর্বল বালকের প্রকাশ হবে। যার নেতৃত্বে হিন্দুস্থানের যুদ্ধে মুসলিমদের বিজয় আসবে। (আখিরুজ্জামানা আল মাহদী ফিল আলামাতিল কিয়ামাহ- ৯১; কিতাবুল আকিব- ৭৭)

৪। হযরত আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত- রসূল (ﷺ) বলেছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না পাঁচটি শাসকের আত্মপ্রকাশ হয়। যারা সর্বক্ষণে ইসলাম ধ্বংসের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকবে। আমি বললাম, তারা কি মুশরিক হবে? তিনি (ﷺ) বললেন, না, তাদের দুইজন মুসলিম যাদের একজন তোমাদের এ ভূমিতেই জন্ম নিবে। যার নাম আমার নামের অনুরূপ। আর একজন নারী শাসক হবে। হিন্দুস্থানের পূর্ব অঞ্চলে সে ক্ষমতায় এসে পূর্ব পুরুষের মূর্তি পূজা বৃদ্ধি করবে। (আখিরুজ্জামানা আল মাহদী ফিল আলামাতিল কিয়ামাহ- ৯২; কিতাবুল আকিব- ৭৯)

৫। হযরত আবু হুরাইরা (রা.) বলেন, রসূল (ﷺ) বলেছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না পাঁচটি নেতার আত্মপ্রকাশ ঘটবে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল (ﷺ), তাদের চিনার উপায় কী? তিনি (ﷺ) বললেন, তাদের একজন তোমাদের এ ভূমিতেই জন্ম

নিবে। যার নাম আমার নামের অনুরূপ। সে ক্ষমতায় থেকে ইসলামকে গলা চেপে হত্যা করবে। আর তাদের একজন হবে অভিশপ্ত জাতির সন্তান। সে বিশ্ব শাসন করবে। আর তাদের তিনজন হবে হিন্দুস্থানের নেতা। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল (ﷺ) তারা তিনজন কী মুশরিক হবে? তিনি (ﷺ) বললেন, না, বরং তাদের একজন হবে নামে মুসলিম নারী শাসক। সে ক্ষমতায় এসে বা'আল মূর্তির পূজা বৃদ্ধি করবে। আর তাদের একজন ক্ষমতায় থেকে ইসলাম ধ্বংসের সূচনা করবে। আর একজন ইসলাম ধ্বংসের প্রতিশ্রুতি দিয়েই ক্ষমতায় আসবে।
(আখিরুজ্জামানা আল মাহদী ফিল আলামাতিল কিয়ামাহ- ৯০; কিতাবুল আকিব- ৭৮)

৬। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূলে পাক (ﷺ) বলেছেন, কিয়ামত ততক্ষণ হবে না, যতক্ষণ না ইলিয়াস (আঃ) নবীর সময়ের মতো মানুষ বা'আল দেবতার পূজা করে। (কিতাবুল ফিরদাউস- ৮০৩)

বা'আল দেবতা সম্পর্কে কুরআনে আলোচনাঃ "নিশ্চয়ই ইলিয়াস (আ.) ছিল রসূল। যখন সে তার সম্প্রদায়কে বললঃ তোমরা কি ভয় কর না ? তোমরা কি বা'আল দেবতার এবাদত করবে এবং সর্বোত্তম স্রষ্টাকে পরিত্যাগ করবে। যিনি আল্লাহ তোমাদের পালনকর্তা এবং তোমাদের পূর্বপুরুষদের পালনকর্তা?" (সূরা আছ-ছফফাত, আয়াত ১২৩-১২৬)

৭। হযরত হুযাইফা (রা.) বলেন, আমি আল্লাহর রসূল (ﷺ) কে বলতে শুনেছি, মানুষের জীবনে এমন একটি সময় আসবে যখন তারা বছরে দু-একবার বিপর্যস্ত হবে। যার একটি শুরু হবে বায়ু দ্বারা। মুশরিকদের দূর্গ ক্ষতিগ্রস্থের মাধ্যমে। আর শেষ হবে দূর্ভিক্ষের মাধ্যমে। আর এই দূর্ভিক্ষ শেষ হতেই মুশরিকরা একটি ফিতনা সৃষ্টি করবে। যার মোকাবেলার জন্য হিন্দুস্থানের পূর্ব অঞ্চল থেকে একদল মুসলিম ধাপিত হবে। কিন্তু মুশরিকরা তাদের এমনভাবে হত্যা করবে যেমনভাবে তোমরা এক নির্দিষ্ট দিনে পশুগুলোর উপর আল্লাহর নাম স্মরণ কর। ফলে তারা পরাজিত হবে। অনুরূপ, আর একটি মুসলিম দল মুশরিকদের দিকে ধাপিত হবে। তাদের সঙ্গে আল্লাহর সাহায্য থাকবে। তারাই বিজয়ী। একথা তিনি (ﷺ) তিনবার বললেন। তারপর বললেন, তাদের নেতা হবে দূর্বল। আহ্, প্রথম দলটির জন্য কতই না উত্তম হতো যদি তারা তাদের নেতাকে গ্রহণ করত। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল (ﷺ) তারা তাদের নেতাকে গ্রহণ করবে না কেন? তিনি (ﷺ) বললেন, সে সময় তারা নিজেরাই নিজেদেরকে যোগ্য মনে করবে। (আখিরুজ্জামানা আল মাহদী ফিল আলামাতিল কিয়ামাহ্- ১১৯)

কীভাবে হবে গাজওয়াতুল হিন্দ

যেহেতু উপরোক্ত হাদিসগুলোতে গাজওয়াতুল হিন্দের অনেক আলামতই উল্লেখ হয়েছে। যেহেতু আলামতগুলো প্রকাশ পাচ্ছে বোঝা গেলে আমাদের বুঝে নিতে হবে হিন্দের যুদ্ধ খুবই সন্নিকটে/কাছে। তাছাড়াও সাড়ে আটশত বছর পূর্বে লিখিত একটি গ্রন্থ শাহ নিয়ামতুল্লাহর কাসিদায়ে সাঁওগাঁত বা কাসিদা, যার অধিকাংশ কথাগুলো বাস্তবায়িত হয়েছে এবং আশ-শাহরানের আগামী কথন কাসিদা থেকে হিন্দের যুদ্ধ কীভাবে হবে তার অনেক আলামত উল্লেখিত রয়েছে। যেগুলো শেষ জামানা নিয়ে বর্ণিত হাদিসের সমর্থন দেয়।

আর আমার (আল মাহমুদ জুয়েল বিন আব্দুল কাদির) যা ধারণাতিত তা থেকে আমি কিছু কথা উল্লেখ করছি। যদিও মানুষের অধিকাংশ ধারণা ভুল। শুরুতেই হিন্দুস্থানের মুশরিকরা দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনার মাধ্যমে সন্দেহের বীজ বপন ও উস্কানির মাধ্যমে একটি মুসলিম শক্তিকে দুই ভাগে বিভক্ত করবে। যা ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ-পাকিস্তান বিভক্তির মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছে। এরপর তারা দুর্বল দেশটির তথা সঙ্গে বন্ধুত্ব রাখবে এবং পাকিস্তানের প্রতি শত্রুতা দেখাবে। এতে হিন্দুস্থান তথা ভারত-বাংলাদেশের সুসম্পর্ক অটল থাকবে। পরবর্তীতে মুশরিকরা সুযোগ বুঝে মুসলিমদের একটি শহর তথা পানজাব কেন্দ্র জম্মু-কাশ্মীর হামলা করবে। যা ইতি মধ্যে শুরু করেছে। এবং ভারতের অভ্যন্তরীণ মুসলমানদের উপর নানা চক্রান্তে হত্যা ও নির্যাতন শুরু করবে। এটাও শুরু করেছে অনেক আগেই। কিন্তু ভারতের মুশরিকরা মুসলমানদের সেই শহরটি দখল নিতে গিয়ে কঠিন পরাজয় ও অপদস্থ হবে। মুসলমানদের সেই শহর তথা কাশ্মীর মুশরিকরা দখলের সময় কাশ্মীরের মুসলমানদের পক্ষে বিশেষ করে আফগান মুজাহিদগণ সহ সকল মুজাহিদরা মুশরিকদের বিরুদ্ধে লড়াই করে কাশ্মীর মুসলিমদের বিজয় আনবে। এমতাবস্থায় মুশরিকরা ক্ষিপ্ত হয়ে তাদের পার্শ্ববর্তী বন্ধু রাষ্ট্র যেটা হবে মুসলিম দেশ- যে দেশের নেতা হবে নারী, অতএব, এই বাংলাদেশ দখলের উদ্দেশ্যে নানা কৌশল অবলম্বন করবে।

হামলার পূর্বে

অবশ্যই বাংলাদেশে প্রতিটি সেক্টরে মুশরিকদের কর্মীগুলোকে সেট করবে। যা ইতিমধ্যে অনেকাংশেই হয়েছে। এবং বাংলাদেশ ও ভারত প্রশাসনের মধ্যে একটি চুক্তি হবে। যেই চুক্তিতে শক্তভাবে লেখা থাকবে- বাংলাদেশের প্রশাসন ভারতে বিভিন্ন স্থানে শিবির স্থাপন

করতে পারবে। বাংলাদেশের বিভিন্ন সুবিধার্থে। এবং ভারতের প্রশাসনও বাংলাদেশে শিবির স্থাপন করবে একই শর্তে। এবং তাদের এই যুদ্ধের পথে যেন কোন রকম ছোট বড় সমস্যা সৃষ্টি না হয় সেজন্য তারা পূর্বেই পশ্চিম বাংলা তথা কলকাতাকে মুশরিকদের মনমত উগ্রবাদী একজন নেতাকে নিযুক্ত করবে। হতে পারে মমতাকে তারা কৌশলে নির্বাচনে পরাজিত করবে অথবা কোন দোষ দেখিয়ে গ্রেফতার কিংবা সরিয়েও দিতে পারে। আবার এমনও হতে পারে, তারা মমতাকেই কোন মাধ্যমে বশে আনতে পারে। এরপর যখন মুশরিকদের সকল পথ বাধা মুক্ত হবে তখন তারা কৌশলে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে অবসর নিতে বলবে। এবং তার পরিবর্তে তার ছেলে অথবা বোনকে ক্ষমতায় বসাবে। এবং বিভিন্ন কৌশলে উস্কানি দেবে বিরোধী দলগুলোকে। ফলে দেশে বিভিন্ন বিশৃংখলা দেখা দিবে। এমতাবস্থায় অবসর প্রাপ্ত প্রধানমন্ত্রী দেশের শান্তি শৃঙ্খলা সৃষ্টির জন্য ভারতের কাছে সাহায্যের আবেদন জানাবে। ভারত এ সুযোগকে কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশে গণহত্যা শুরু করবে।

এ অবস্থায় বাংলাদেশের আলেম সমাজই বুঝে যাবে, হয়তে এটাই প্রতিশ্রুত গাজওয়াতুল হিন্দ। যে কারণে তারাও দেশের বিভিন্ন স্থানে মিটিং-মিছিল পোস্টারিং শুরু করবে। এবং মুশরিকদের মোকাবেলায় সংঘবদ্ধভাবে সামনে এগিয়ে যাবে। তখনই মুশরিকরা হামলা করে মুসলিমদের গণহত্যা করবে। নারীদের সম্মানহানি করবে, লুট-পাটসহ বিভিন্ন নৈরাজ সৃষ্টি করবে। আবার এমনও হতে পারে প্রধানমন্ত্রী অবসর না নিয়েই ক্ষমতায় থাকা অবস্থাতেই মুশরিকরা কৌশলে বাংলাদেশের নাস্তিক সম্প্রদায়কে দিয়ে মুসলমানদের কোন ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানতে পারে। ফলে বাংলাদেশের মুসলিমরা ক্ষিপ্ত হয়ে আন্দোলন মুখী হতে পারে। ফলে প্রধানমন্ত্রী নিয়ন্ত্রণ না করতে পেরে দেশের শান্তি শৃঙ্খলা ফিরে আনার জন্য ভারতের নিকট সাহায্যের আবেদন জানাবে। এ সুযোগ কাজে লাগিয়ে ভারত এদেশে গণহত্যা শুরু করবে। এবং প্রধানমন্ত্রী তা বুঝে ওঠার আগেই ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলবে। ফলে এ হত্যাকাণ্ড কঠিন আকার ধারণ করবে। সেই সময়টাকে শাহ নিয়ামতুল্লাহ ও আস-শাহরান 'দ্বিতীয় কারবালা' বলে অ্যাখ্যায়িত করেছেন। এমন সময় একদল মুসলিম জামাত এই হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে সামনে অগ্রসর হবে। এবং তাদেরকেও গণহত্যা করা হবে। সে সময় আল্লাহর নুসরত প্রাপ্ত দলটি আল্লাহর দেখানো নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নেবে। এবং আল্লাহর নির্দেশনায় ইঙ্গিতে/ইশারায় আল্লাহর নাম নিয়ে যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়বে। আর তাদের সঙ্গে আল্লাহর দয়া ও নুসরা থাকবে। তখন বাংলাদেশের প্রশাসন ও সাধারণ মানুষ তিন দলে বিভক্ত হয়ে যাবে। একদল ভারতের শক্তিকে ভয় পেয়ে তাদের নিকটই আশ্রই নেবে। একদল

আল্লাহর নুসরাহ প্রাপ্ত দলের সঙ্গে যুক্ত হবে এবং ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ করবে। আর একদল দেশ রক্ষার জন্য দেশকে ভালোবেসে আল্লাহর নুসরাহ প্রাপ্ত দলের সঙ্গে যুক্ত হবে এবং ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ করবে।

যখন ভারতের সঙ্গে ভারতের পূর্ব (বাংলাদেশ) দিকের মুসলমানদের যুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে। তখন ভারতের পশ্চিম দিক থেকেও আফগান বিজয়ী গাজী মুজাহিদগণ সহ অন্যান্য মুজাহিদগণও ভারতকে কঠিনভাবে আক্রমণ করবে। এবং অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রগুলো ভারতের প্রতি আক্রমণে অংশ নেবে। এক পর্যায়ে ভারতের পশ্চিম দিকের মুজাহিদদের আক্রমণে অধিক ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ায় তাদের ঠেকানোর জন্য অধিক মনোযোগী হবে। এবং পূর্ব দিকের মুজাহিদদের আক্রমণের প্রতি অমনোযোগী হয়ে উঠবে। ফলে পূর্ব দিকের মুজাহিদগণ ২৫-৩০ খন্ডযুদ্ধে ভারতের অধিকাংশেরও বেশি বিজয় করবে। এমতাবস্থায় বুঝতে পেরে ভারত নাজেহাল পরিস্থিতির সম্মুখীন হবে এবং সকল দিক হারিয়ে ফেলবে। এই অবস্থায় হিন্দুস্থানের মুশরিকদের সহযোগিতার জন্য ইহুদী-খ্রীষ্টানদের বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলো যুদ্ধে অংশ নেবে। ফলে সেখানে পারমানবিক ক্ষেপণাস্ত্রসহ বড় বড় অস্ত্রগুলো ব্যবহার হবে। তা থেকে ভয়ংকর তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হবে। সে ব্যাপারে হাদিসে বর্ণিত আছে।

হযরত মুয়াজ ইবনে জাবাল (রা.) বলেন, রসূল (ﷺ) বলেছেন, অচিরেই ইহুদী-খ্রীষ্টানরা একে অপরকে অগ্নি নিক্ষেপ করবে। ফলে সকল মানুষই ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে পড়বে। (কিতাবুল ফিরদাউস- ১১৭৯)

হযরত ফিরোজ দায়লামি (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আখেরী জামানায় ইমাম মাহদীর পূর্বে ইমাম মাহমুদ এর প্রকাশ ঘটবে। সে বড় যুদ্ধের শক্তির জোগান দেবে। তার জামানায় মহাযুদ্ধের বজ্রাঘাতে বিশ্বের অধ্বঃপতন হবে এবং বিশ্ব এই সময়ে ফিরে আসবে। সে তার সহচর বন্ধু সাহেবে কিরান বারাহ কে সাথে নিয়ে যুদ্ধ পরিচালনা করবে – যে বেলাল ইবনে বারাহ্ এর বংশধর হবে। তোমরা তাদের পেলে জানবে ইমাম মাহদীর প্রকাশের সময় হয়েছে। (আসরে যুহরি, ১৮৭ পৃঃ; তারিখে দিমাশাক, ২৩৩ পৃঃ; ইলমে তাসাউফ, ১৩০ পৃঃ; ইলমে রাজেন, ৩১৩ পৃঃ; বিহারুল আনোয়ার, ১১৭ পৃঃ)

এছাড়াও আস-সুনানু ওয়ারিদাতুল ফিল ফিতান গ্রন্থে কোন দেশ কোন দেশের উপর পারমানবিক বোমা ব্যবহার করবে। সে ব্যাপারে হাদিসের ইঙ্গিতে রয়েছে।

তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে অধিকাংশ মানুষই ক্ষতিগ্রস্থ হবে। এ ব্যপারে কাজী মুফতি ইব্রাহিম বলেন, এখন দেখছো মানুষ আটশত (৮০০) কোটির বেশি অচিরেই দেখবে মানুষ ২০০-২৫০ কোটিতে এসেছে। কেননা, এটা ইমাম মাহদীর আগমনের আলামত সমূহের একটি। (আমার প্রথম থেকে এ পর্যন্ত আলোচনা সকল ব্যপারেই আল্লাহ 'আলিম)।

যে বিষয়টি আমাদের অবশ্যই লক্ষণীয়

১। শেষ জামানা হাদিসগুলো নিয়ে যথেষ্ট মতবিরোধ রয়েছে। যে হাদিসটি ঘটে যায় তা অবশ্যই আল্লাহর রসূল (ﷺ) এর কথা। তা মেনে নেওয়া আমাদের জন্য জরুরী।

২। শেষ যামানার হাদিসগুলো এমন যে, যখন সেই সময় আসে মনে হয় যে, হয়তো এই সময়ের জন্যই হাদিসটি **বর্ণিত হয়েছে। আবার যদি কেহ এ কথায় ভেবে বসে থাকে যে, যদিও এ হাদিসটি এ সময়ের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে, তারপরও** হয়তো আরো বাস্তব ভাবে মিলতে পারে। সামনে সময়ে তখনই আমরা ঐটাকে গ্রহণ করব। তবে এটা একটা বড় ভুল ও অজ্ঞতা ছাড়া কিছুই না। কেননা প্রথমেই যখন তা বাস্তবের সঙ্গে মিলে গেছে তখন সেটিই মেনে নিয়ে সামনের সময়ের জন্য সকল প্রস্তুতি নিয়ে থাকতে হবে। কারণ যদি সামনেরটা না হয়ে বর্তমানটাই সঠিক সময় হয় তবে তার জন্য কঠিন আফসোস আর পস্তানো ছাড়া কিছু থাকবে না। আর যদি বর্তমানটাই মেনে নেয় এবং সকল প্রকার প্রস্তুত থাকি অথচ এই সময় হাদিসের বর্ণিত সেই সময় নয়, তবে নিজেকে প্রস্তুত সহকারে সামনের সময়টাও পেয়ে যাব।

গাজওয়াতুল হিন্দের প্রস্তুতি

যে কোন যুদ্ধের বিজয় লাভের জন্য একই জিনিসের প্রয়োজন। যা মহান আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তোমরা তাদের মোকাবেলার জন্য যথাসাধ্য শক্তি ও অশ্ব বাহিনী প্রস্তুত রাখিবে। এ দ্বারা তোমরা ভীত-সন্ত্রস্ত করিবে আল্লাহর শত্রুকে, তোমাদের শত্রুকে এবং তাদের ছাড়াও অন্যান্যদেরকেও যাদেরকে তোমরা জানো না। আল্লাহ তাদেরকে জানেন। আল্লাহর পথে তোমরা যাহা ব্যয় করিবে উহার পূর্ণ প্রতিদান তোমাদেরকে দেওয়া হইবে এবং তোমাদের প্রতি জুলুম করা হইবে না।" (সুরা আনফাল ৮:৬০)

(১) শক্তি (২) অশ্ববাহিনী, ঘোড়া-যানবাহন, অস্ত্রসজ্জায় সজ্জিত সৈনিক (৩) যাহা কিছু ব্যয়-অর্থ-সম্পদ, ও সময়।

মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন, "যাহারা ঈমান আনিয়াছে, হিজরত করিয়াছে ও আল্লাহর পথে জিহাদ করিয়াছে, তারাই প্রকৃত মুমিন, তাহাদের জন্যই ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা রয়েছে।" (সুরা আনফাল ৮:৭৪)

(১) ঈমানী শক্তি (২) হিজরত; যারা নির্যাতিত হয়ে অন্য অঞ্চল থেকে যুদ্ধের জন্য আসবে। এটা না আসলেও হবে কারণ এটা যুদ্ধের শর্ত নয়। (২) আল্লাহর পথে জিহাদকারী মুজাহিদ যোদ্ধা (৪) এই সকল যোদ্ধাও হিজরত করে আসা ব্যক্তিদের আশ্রয় দানকারী তথা নিরাপদ স্থান (৫) তাদেরকে অর্থ সম্পদ ও থাকাসহ সকল বিষয়ে সাহায্য দানকারী দল। তাদেরকেই মহান আল্লাহ তা'আলা প্রকৃত মুমিন বলে অ্যাখ্যায়িত করেছেন।

মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন, তোমাদের মধ্যে যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আল্লাহ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিতেছেন যে, তিনি অবশ্যই তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব দান করিবেন। যেমন তিনি প্রতিনিধিত্ব দান করিয়াছিলেন তাহাদের পূর্ববর্তীদের এবং তিনি অবশ্যই তাহাদের জন্য প্রতিষ্ঠিত করিবেন দ্বীনকে যাহা তিনি তাহাদের জন্য করিয়াছেন এবং তাহাদের ভয়-ভীতির পরিবর্তে তাহাদেরকে অবশ্যই নিরাপত্তা দান করিবেন। তাহারা আমার ইবাদাত করিবে, আমার কোন শরীক করিবে না। অতঃপর যাহারা অকৃতজ্ঞ হইবে তাহারা তো সত্যত্যাগী। (সুরা আন-নুর ২৪:৫৫)

(১) নিরাপত্তা; যেমন আল্লাহর রসূল (ﷺ) এক সাহাবাদের জন্য মদিনা ছিলো, আর এটা সকল যুদ্ধের জন্যই অতিজরুরী। যেখান থেকে আমীর যুদ্ধের জন্য বিভিন্ন স্থানে সৈনিক পাঠাবেন এবং সৈনিকগণ দীর্ঘক্ষণ যুদ্ধ শেষে সেই স্থানে গিয়ে একটু স্বস্তি পাবেন। যুদ্ধের মাঠে কোনো সৈনিক আহত হইলে অথবা কোন যুদ্ধে সৈনিকগণ পরাজিত হলে দ্রুত বেগে এসে সেখানে স্থান নিতে পারবে। সেই নিরাপদ স্থানে হিজরত কারী ও যুদ্ধাদের স্ত্রী-সন্তান, পিতা-মাতা, দূর্বল, অসুস্থ আত্মীয়-স্বজন যুদ্ধ চলাকলীন সময়ে অর্থাৎ চূড়ান্ত বিজয়ের আগ পর্যন্ত নিরাপদ থাকবে। আর তা দেখে যুদ্ধরত মুজাহিদগন দীর্ঘ সময় যুদ্ধ করে ক্লান্ত হয়ে আসার পরেও মাঝে মধ্যে একটু স্বস্থি ফিরে পাবে। উদাহরণ স্বরূপ, কোন অভাবী দরিদ্র শ্রমিক সারাদিন মাঠে খেতের কাজে শ্রম দেওয়ার পর বাড়িতে ফিরে এসে স্ত্রী-সন্তানদের নিয়ে রাত্রী যাপন করতে এবং মনে সুখে আনন্দের শ্বাস ফেলতে পারে। আর এমন শ্রমিক যারা দিন শ্রম দিয়ে এসে রাতে এমন

একটি গৃহে রাত্রী যাপন করতে হয়। যে গৃহের কোন ছাদ নেই, আর স্ত্রী-সন্তানদের কোন নিরাপত্তা নেই। অথবা তাদের রাত্রী যাপনের ঘরটাও ভাঙ্গা ও দূর্বল, অথবা দূরবর্তী অন্য এক জায়গায় কাজের জন্য শ্রম দিতে গিয়েছে এবং সেখানে তার থাকা খাওয়া ও জায়গাটা অনেক আরামদায়ক ও সুস্বাদু। সে যেকোন মাধ্যমে সংবাদ পেল তার নিজ এলাকায় কঠিন ঝড়-বৃষ্টি হচ্ছে অথচ সে যেখানে রয়েছে সেখানে ঝড় বৃষ্টি হলেও সে রয়েছে ইট পাথরের তৈরি দালান ঘরে যা তার জন্য নিরাপদ। তবে তার অন্তরে কেমন স্বস্তি থাকবে? সে কাজে কেমন অমনযোগী হবে? বুদ্ধিমান/জ্ঞানীদের জন্য তা উপলদ্ধী করা জরুরী।

যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সমূহ

(১) জনশক্তি ও প্রস্তুত সৈন্য (২) যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় যানবহন ও সরংজাম সহ সৈনিক (৩) নিরট ধনয় অর্থ-সম্পদ দাতা (৪) ঈমানী শক্তি (৫) যুদ্ধের আশেপাশে আশ্রয়দানকারী আনছার (৬) যুদ্ধাদের বিভিন্ন প্রটেকশন দানকারী আনছার (৭) নিরাপদ স্থান তথা যুদ্ধা প্রস্তুতি স্থান। সর্বোপরি যুদ্ধের জন্য চারটি জিনিস অতি জরুরী।

(ক) জিহাদের মাঠে লড়াই করার জন্য মুজাহিদ (খ) যুদ্ধের জন্য সর্বপ্রকার সরঞ্জাম (গ) মুজাহিদদের বিভিন্নভাবে সাহায্যকারী আনছার (ঘ) যোদ্ধা তৈরি ও যোদ্ধাদের প্রিয়জনদের নিরাপত্তার জন্য নিরাপদ স্থান।

যুদ্ধে বিজয়ের প্রধান শর্ত

মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তোমরা হীনবল হইওনা এবং দুঃখিতও হইওনা, তোমরাই বিজয়ী যদি তোমরা মুমিন হও।" (সুরা আল-ইমরান ৩:১৩৯)

যুদ্ধের সেনাপতির গুণাবলী

(১) মুমিন হতে হবে (২) অধিক আল্লাহ ভীরু হতে হবে (৩) ধৈর্যশীল হতে হবে (৪) আনুগত্যশীল হতে হবে (৬) উপস্থিত বুদ্ধির অধিকারী হতে হবে।

সর্বশেষ বিষয়

যুদ্ধ অর্থ কৌশল। আর যে যত কৌশল অবলম্বন করতে পারবে তার বিজয় তত সুনিশ্চিত। আর যুদ্ধের সৈনিক সাজানোতে আছে জয়-পরাজয়। আর এই সাজানো এর কৌশল অবলম্বনে অবশ্যই আল্লাহর নুসরাহ অতিজরুরী। তা ব্যতিত কোন ক্ষুদ্র যুদ্ধেও বিজয় অর্জন অসম্ভব।

আর সম্মানিত ও অতি সম্মান লাভের প্রতিশ্রুত যুদ্ধ গাজওয়াতুল হিন্দ। আল্লাহ প্রদত্ত এ পূর্ব ঘোষিত যুদ্ধ। অবশ্যই এই যুদ্ধের আল্লাহ প্রদত্ত নেতার নেতৃত্বেই বিজয় অর্জন সম্ভব। নয়তো হাদিসে বর্ণিত প্রথম দলটির অন্তর্ভুক্ত হতে হবে। আর আল্লাহ প্রদত্ত দলটি আল্লাহর নুসরাহ প্রাপ্ত হবে। আর কীভাবে গাজওয়াতুল হিন্দ হবে তা একমাত্র আল্লাহ প্রদত্ত আমীরই জানবে। যতক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধের বিজয় না আসবে ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধের কৌশল সকলের নিকট উন্মেচন না করে আমীরের নিকটেই গোপন রেখে কাজ করে যাওয়াটাই অধিক কল্যাণকর।

মহান আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছে করলে তার মনোনীত ব্যক্তিদের জালিমদের জনপদেও নিরাপদ স্থান দান করতে পারেন। অবশ্য এ কাজটি মানুষের কল্পনায় খুবই কঠিন হলেও মহান আল্লাহ তা'আলার নিকট সহজ। যার দৃষ্টান্ত মূলক উদাহরণ 'আসহাবে কাহাফ' এর যুবকগণ। যাদেরকে মহান আল্লাহ তা'আলা 'রাকীম' পর্বতের গুহায় নিরাপদ স্থান দান করেছিলেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তোমরা যখন বিচ্ছিন্ন হইলে উহাদের হইতে ও উহারা আল্লাহর পরিবর্তে যাহাদের ইবাদত করে তাহাদের হইতে তখন তোমরা গুহায় আশ্রয় গ্রহণ কর। তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্য তাহার দয়া বিস্তার করিবেন এবং তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের কাজ ফলপ্রসূ করিবার ব্যবস্থা করিবেন।" (সুরা কাহফ ১৮:১৬)

যুদ্ধের বিজয়ের জন্য মধ্যম পন্থা প্রয়োজন। আমাদের মাঝে সবচেয়ে যে সমস্যাটা বেশি দেখা দেয় তা হলো- যুদ্ধ মানেই কঠোরতা, যুদ্ধ মানেই শত্রুপক্ষকে আক্রমণ করা। ফলে অনেকেই অধিক ত্বরাপ্রবণ হয়ে শত্রুর ঘাটিতে আক্রমণ করে বসে। অথচ তারা আক্রমণের পূর্বে বোঝার চেষ্টাও করে না যে, ঘাটিটা কি শত্রুর ছিল? না মিত্রর? যদি শত্রুর হয় তবে চূড়ান্ত যুদ্ধের পূর্বে শত্রুকে মিত্র করার কৌশল তৈরি করা যায় কিনা? আর চূড়ান্ত যুদ্ধের পূর্বেই শত্রু পক্ষকে সত্য গ্রহণের আহবান জানানো সুন্নাত। যদিও সত্য (ইসলাম) বর্তমান সময়ের সকলের নিকটেই পৌঁছে গেছে। কিন্তু যে বিষয়ে তাদের সাথে যুদ্ধে জড়ানো হচ্ছে সে বিষয়টা তাদেরকে অবগত করা। এই কাজটির ক্ষেত্রে আমরা অনেকাংশই পিছিয়ে রয়েছি।

যার দরুন এমন কিছু ঘটনা ঘটে যাচ্ছে যে, এক মুসলমান আরেক মুসলমানকে কোন নিয়ম পদ্ধতি ছাড়াই নিজে নিজেই কাফের ফতুয়া দিয়ে হত্যা বা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। অথচ, মুশরিকদের হত্যার ক্ষেত্রেও মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন, "মুশরিকদের কেহ তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করিলে তুমি তাহাকে আশ্রয় দিবে যাহাতে সে আল্লাহর বাণী শুনিতে পায়। অতঃপর তাহাকে তাহার নিরাপদ স্থানে পৌছইয়া দিবে, কারণ তাহারা অজ্ঞ লোক।" (সুরা তাওবাহ ৯:৬)

যখনই কেহ কোন নিয়ম নীতি অবলম্বন না করেই যুদ্ধের জন্য কোথাও আক্রমণ করেছে তখনই শত্রু বাহিনীর নিকট থেকে মুজাহিদিনদের অধিকাংশই ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। তার কারণ যুদ্ধের স্থানগুলোর আশে পাশে মুজাহিদদের জন্য না কোন আশ্রয় স্থল থাকছে, আর না কোন এমন ব্যবস্থা থাকছে যে, যখনই মুজাহিদগণ শত্রু বাহিনীর অভ্যন্তরে ঘিরাও হয়ে গেছে অল্প কিছু মাল-সামান নিয়ে তখনই শত্রু পক্ষকে পিছন থেকে আক্রমণের কোন ব্যবস্থা অথবা বাহিনী প্রস্তুত থাকছে। যার ফলে পরবর্তীতে কঠিন ক্ষতির সম্মুখীন হতে হচ্ছে মুজাহিদদের। সে ক্ষতির থেকে পরিত্রানের উপায় নেতৃত্ব স্থানীয় ব্যক্তিদের সচেতন ও কর্মীদের সঠিক আনুগত্য।

নেতৃত্বস্থানীয় ব্যক্তিদের সচেতনতা

অবশ্যই যে কোন সিদ্ধান্ত কার্যকর ও আক্রমণের পূর্বে নেতাদেরকে খুবই সচেতন হতে হবে। কেননা সেই মুহূর্তে তাদের সিদ্ধান্তের উপরেই অনেকাংশে যুদ্ধের লাভ-ক্ষতি স্থির থাকে। এ সময় নেতাদের একটু স্থির হয়ে এ কথা ভাবা জরুরী যে, যেই সিদ্ধান্ত আমরা কার্যকর করার প্রস্তুতি নিচ্ছি, সেক্ষেত্রে আমাদের মুজাহিদ ভাইদের কতটুকু লাভ-ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে। এক্ষেত্রে কুরআনে বর্ণিত একটি ঘটনা আমাদের স্মরণ রাখা জরুরী। তা হলো-

মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন, "যখন উহারা পিপীলিকা অধ্যুষিত উপত্যকায় পৌছিল তখন এক পিপীলিকা বলিল, হে পিপীলিকা বাহিনী! তোমরা তোমাদের গৃহে প্রবেশ কর। যেন সুলাইমান এবং তাহার বাহিনী তাহাদের অজ্ঞাতসারে তোমাদেরকে পদতলে পিষিয়ে না ফেলে।" (সুরা নামল ২৭:১৮)

উক্ত আয়াতের ঘটনা থেকে নেতাদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় হলে যেকোন সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের শুরুতেই কর্মীদের বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া। কেননা এমন যেন না হয় যে, কর্মীরা দুনিয়ার সকল পিছুটান ফেলে নেতার সিদ্ধান্তের প্রতি নিজেদের মাল ও জান উৎসর্গে প্রস্তুত হয়েছে অথচ

নেতার সিদ্ধান্তের কোন এক ভুলে অসংখ্য কর্মীর প্রাণ ঝরে গেল অথচ সেই সিদ্ধান্তের কর্মটা বাস্তবায়নও হলো না। আবার নেতাদের সচেতনাতেও কোন ফলপ্রসূ কাজ হয় না, যদি না কর্মীদের মধ্যে নেতার প্রতি সঠিক আনুগত্য না থাকে।

কর্মীদের সঠিক আনুগত্য

যে কোন বিষয়েই অবশ্যই নেতার প্রতি কর্মীদের সঠিক আনুগত্য থাকতে হবে। নচেৎ যেকোন কর্ম বাস্তবায়নই নেতা ও কর্মী উভয়কেই কঠিন ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে। যার সামাল দেওয়াটাই হবে দূর্বিসহ। কেননা অনেক সময় দেখা যায় অনেক কর্মীরা নিজেদের নেতাদের থেকে নিজেদেরকেই অনেক জ্ঞানী ও কৌশলী কল্পনা করে। ফলে নেতার হুকুম ছাড়াও কর্মীরা শুধু নিজেদের সিদ্ধান্তেই অনেক কর্ম বাস্তবায়ন করতে চায়। আবার কোন কোন কর্মী নেতার নিষেধাজ্ঞাকে অমান্য করেও কোন কর্ম বাস্তবায়নে অগ্রসর হয়। এটা এজন্য যে, তারা নেতার হুকুমের চেয়েও নিজের মনের সিদ্ধান্তকে অধিক সঠিক কল্পনা করে। যা পরবর্তীতে সেই মুজাহিদ সংগঠনসহ গোটা মুসলিম সমাজকেই ক্ষতির দিকে নিয়ে যায়। যার ফলে পরবর্তীতে কোন ইসলামী সংগঠন সামনে অগ্রসর হবার সুযোগ পায় না। এর জন্য নেতাদের প্রতি কর্মীদের সঠিক আনুগত্য অপরিহার্য।

কীভাবে সমাধান

অবশ্যই এই সমস্যা থাকাটা খুবই স্বাভাবিক। কেননা সকল মানুষই অন্যদের থেকে নিজেকেই অধিক জ্ঞানী মনে করে ফলে নেতা-কর্মীদের প্রতি গুরুত্ব না দিয়েই যে কোন কঠিন কর্ম বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নেয়। আর পরবর্তীতে ঝড়ে যায় অসংখ্য প্রাণ, ক্ষতিগ্রস্থ হয় কর্মীদের পরিবার। অথচ সেই মুহূর্তে নেতাদের ভূমিকা স্থীর/বুঝে ওঠতেই পারে না তখন কোন সিদ্ধান্তটা জরুরী। আবার বিভিন্ন সময়ে নেতাদের সিদ্ধান্ত ছাড়াই কর্মীরাই নিজেদের জ্ঞানী পরিচয় দিতে কোন কঠিন কর্ম বাস্তবায়নে অগ্রসর হয়। যার জন্য ক্ষতির সম্মুখীন উভয়কেই হতে হয়। যার আলোচনা পূর্বে করেছি। এই সমস্যার একমাত্র সমাধান আল্লাহ প্রদত্ত নেতা। যিনি মহান আল্লাহর নির্দেশনায় ইঙ্গিতে যেকোন কঠিন কর্ম বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নেবে।

যার সিদ্ধান্তই হবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। যেখানে কর্মী ও কর্মীদের পরিবারের প্রতি থাকবে নেতার সমান গুরুত্ব। সেখানে কর্মীদের কর্মঠতা দেখে বাছাই হবে না। বাছাই হবে মুসলিম হিসেবে।

সেখানে শুধু কর্মীদের প্রতিই গুরুত্ব থাকবে না, গুরুত্ব থাকবে নারী-শিশু, বৃদ্ধ-মাজুর সহ সকলের প্রতিই সমানভাবে।

আর কর্মীরাও অবগত থাকবে নেতার পক্ষ থেকে এ সিদ্ধান্ত শুধু নেতার নয়। এখানে মহান আল্লাহ তা'আলার নির্দেশনার ইঙ্গিত রয়েছে। সুতরাং, নেতার সিদ্ধান্তের বাহিরে নিজেদের কোন সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করতে গেলে অবশ্যই ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। সুতরাং, যখন নেতা-কর্মী উভয়ই আল্লাহর নির্দেশনার ইঙ্গিতে কোন কর্ম বাস্তবায়ন করতে যাবে অবশ্যই তাতে কল্যাণ ও বারাকাত প্রাপ্ত হবে। যদি একদিক দিয়ে ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে পরীক্ষায় পতিতও হয় তবুও অন্য দিক দিয়ে আল্লাহর নুসরাহ সেখানে এসে পৌছবে। কেননা মহান আল্লাহ তা'আলা তার কোন বান্দার প্রতি অতিরিক্ত দ্বায়িত্বের ভার চাপিয়ে দেননা। এবং কোন বান্দার প্রতি জুলুম করেন না।

মহান আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে উপরোক্ত আলোচনা বুঝার ও তদানুযায়ী আমল করার তাওফীক দান করুন। আমিন।

হে আল্লাহ! আমি তোমার পূত-পবিত্রতা ঘোষণা করছি তোমার প্রশংসাসহ। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে তুমি ছাড়া সত্যিকারের কোন মাবুদ নেই। তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তোমারই নিকট তাওবা করি।

আখীরুজ্জামান গবেষণা কেন্দ্র থেকে প্রকাশিত আরো বইসমুহঃ

- ইমাম মাহমুদের ঐক্যের ডাক।
- গাজওয়াতুল হিন্দ এর সংক্ষিপ্ত আলোচনা।
- আখীরুজ্জামান গবেষণা ও তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ।
- সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক আল্লাহ।
- গাজওয়াতুল হিন্দ -কড়া নাড়ছে আপনার দুয়ারে।
- কি হয়েছিল সেইদিন? -আবু উমার।
- আপনার যাকাতে যাদের হক রয়েছে।